চিনকেন্দ্রিকতার পুনর্বিবেচনাঃ এশিয়ার ঐতিহাসিক আন্তঃসংযোগ ভবিষ্যতের বিষয়ে আমাদের কি বলে

মনজিত এস. পরদেশী

১১ নভেম্বর, ২০২৪

এই মুহূর্তে আমরা একটি বিশ্ব-বিন্যাসে পরিবর্তনের ঠিক মাঝখানে অবস্থান করছি। পশ্চিম ও, বিশেষ করে, পাশ্চাত্যের প্রতি বাকি পৃথিবীর পক্ষপাতের কারণে তৈরি হওয়া ক্ষমতার সুবৃহৎ অসামঞ্জস্যসহ গত দুই শতাব্দী ধরে চলে আসা পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক বিন্যাসটি ছিল একটি কেন্দ্র-প্রান্ত পৃথিবী। তবে, এশিয়ার বর্তমান উত্থান একটি নতুন বিশ্ব-বিন্যাসের সূচনা করেছে। এই সদ্যোত্থিত বিশ্ব-বিন্যাসের চেহারা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও নীতিনির্ধারণর বৃত্তে একটি বহুবিতর্কিত প্রশ্ন এবং, তার সঙ্গে সঙ্গেই, চিনের উত্থান এই পরিবর্তনের অগ্রভাগে উপস্থিত। তাই, বিশ্বের বিন্যাসের সম্ভাব্য রূপরেখা নিয়ে কিছু বলা সম্ভব কিনা, তা বোঝার জন্য অনেক পণ্ডিত ও নীতিনির্ধারকই যে চিন ও এশিয়ার অতীতের দিকে তাকাচ্ছেন, তা খুব আশ্চর্য নয়।

আশ্চর্যজনক এবং হতাশায় ভরা বিষয়টি হল, চিন ও এশিয়ার অতীতের ক্ষেত্রেও, এই দুই-এর মুখ্য অভিমত সেই কেন্দ্র-প্রান্ত রূপরেখার দিকেই নির্দেশ করে। এই মতামত, গত দুই শতকের পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক কেন্দ্র-প্রান্ত বিন্যাসের বিপরীতে, একটি চিনকেন্দ্রিক বিন্যাসকে বসিয়েছে। "আনুগত্য-প্রদর্শন প্রণালী" বলে অনেক সময়ই আখ্যায়িত এই চিনকেন্দ্রিক বিশ্ব, আক্ষরিক, অর্থেই অনুগত ও আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র দ্বারা পরিবৃত চিনকে পৃথিবীর কেন্দ্রে রাখে। এই আনুগত্য-প্রদর্শন প্রণালীকে ভবিষ্যতের চিনকেন্দ্রিক বিশ্বের মাপনদণ্ড হিসেবে ধরা হয়। ২০১৮ সালে, জিম ম্যাটিস যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব ছিলেন, তখন তিনি বলেন, "আদর্শ হিসেবে মিং সাম্রাজ্যের একটি পেশীবহুল সংস্করণকেই বর্তমান চিন বেছে নিয়েছে, এবং তারা দাবি করে যে অন্যান্য রাষ্ট্র অনুগতভাবে বেইজিংকে অনুসরণ করে।

সাম্প্রতিক পাণ্ডিত্য সঠিকভাবেই বর্ণনা করে যে, এই চিনকেন্দ্রিক প্রেক্ষিতটি বিশ্ব-বিন্যাসের "বাস্তবিক ব্যাখ্যা" একেবারেই নয়। এটি, বড় জোর, কিছু চিনকেন্দ্রিক অভিজাত দেশের দর্শন, এবং এই মতাদর্শটিকে ভুল করে এবং ব্যাপকভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এমনকি মনে করা হয় যে সাম্প্রতিক শতাব্দীতে পশ্চিমের উত্থানের আগে এই চিনকেন্দ্রিক বিশ্ব-বিন্যাস দুই হাজার বছর ধরে প্রচলিত ছিল। পূর্ব এশিয়ার মত চিনকেন্দ্রিক অঞ্চলগুলির এই সমসাময়িক বিশ্ব, অতীতের শতাব্দীতেও একই রকমভাবে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ "আঞ্চলিক

পৃথিবীই" ছিল, যারা পরস্পরের থেকে চমৎকার নিঃসঙ্গতায় অধিষ্ঠিত ছিল – এই ধারণাটি থেকেই অংশত এই ভুল ব্যাখ্যাটি উঠে আসে। এই "বদ্ধ" আঞ্চলিক পৃথিবীগুলির রূপরেখাটিই চিনকেন্দ্রিকতা নিয়ে গবেষণা ও আলোচনার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই চিনকেন্দ্রিক বিশ্ব-বিন্যাসের সঙ্গে জড়িত প্রয়াত ঐতিহাসিক জন ফেয়ারব্যাঙ্কের মতে, "ভৌগলিক" অবস্থানই পূর্ব এশিয়াকে "পশ্চিমের দেশগুলি ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এবং সমস্ত মহান সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট করে তুলেছিল।"

তবে, অতীতে পূর্ব এশিয়ার মত সাম্প্রতিক বিশ্ব-অঞ্চলগুলি কখনই বিস্তৃত এশিয়ার থেকে ঠিক অভেদ্যভাবে রুদ্ধদ্বার ছিল না। এই অঞ্চলগুলি "মুক্ত" ও পরস্পরের সঙ্গে জড়িত ছিল, কারণ ঐতিহাসিক এশিয়া, স্থলপথ ও সমুদ্রপথের মাধ্যমে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। বিভিন্ন শতাব্দীতে এই আন্তঃসংযোগের প্রকৃতি বদলেছে বটে, কিন্তু বাস্তবের "একটি সত্য বর্ণনা" বলে, দুই হাজার বছর ধরে চলতে থাকা চিনকেন্দ্রিক বিশ্ব-বিন্যাসের এই কাহিনীটির ইতিহাসে কোনও অস্তিত্বই নেই। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মিং সাম্রাজ্যকালের শুরুর দিকে একটি আন্তঃসংযুক্ত কাঠামোর মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে পূর্ব এশিয়া জড়িত ছিল, তাহলে স্পষ্টতই, সাম্রাজ্যবাদী চিন মধ্য এশিয়ার তিমুরিদদের থেকে "রাজনৈতিক সাম্য" আদায়ের পাশাপাশি "[শুধুমাত্র] চিনেই বিশ্ব-আধিপত্য"-এর দাবি করে। একইভাবে, পনের শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক বিশ্বের কেন্দ্র মিং সাম্রাজ্য ছিল না। এই সম্মান বরং প্রাপ্য রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিকভাবে ভারত মহাসাগরের উপর নির্ভরশীল মেলাকা-র মত বন্দর-কেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এবং পার্সী-ইসলামিক সংস্কৃতির, যদিও দ্বিতীয়টি চিনের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক সংযোগকে মূল্য দিত।

অন্যভাবে বলতে গেলে, বিশ্লেষণাত্মক আদেশের মধ্যমে পূর্ব এশিয়াকে "বন্ধ" ও বিচ্ছিন্ন করার বদলে, চিনকেন্দ্রিক অভিজাত দেশগুলির সাড়ম্বর বক্তব্য সত্ত্বেও, এশীয় ইতিহাসের আন্তঃসংযুক্ত প্রেক্ষিত বিশ্ব-বিন্যাসের কেন্দ্র থেকে চিনকে সরিয়ে দেয়। বিশেষ করে, প্রথম সহস্রাব্দে চিন ও ভারতের মধ্যে বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে যে সংযোগ গড়ে উঠেছিল, তা একটি বিকেন্দ্রিক এশীয় বিন্যাসকে পোষণ করেছিল, এবং একটি চিনকেন্দ্রিক দর্শনের উপরেও তার একটি গভীর প্রভাব পড়েছিল। সুই-তাং রাজত্বকালে (৫৮৯-৯০৭ সাধারণ অব্দ), যেহেতু চিন ভারতের বৌদ্ধ পুণ্যভূমির প্রান্তে অবস্থিত, তাই বৌদ্ধ ভারতের প্রেক্ষিতে চিন "সীমান্তবর্তী অঞ্চলকেন্দ্রিক জটিল মানসিক অবস্থায়" ভুগছিল। লক্ষণীয়ভাবে, চিনের অধিবাসীরা নিজেরাই তৎকালীন চিনকে বর্ণনা করার জন্য *চুংকুয়ো* বা "মধ্য সাম্রাজ্য" শব্দটি ব্যবহার করতেন না। তার বদলে, তাঁরা ভারতের উদ্দেশ্যে ওই শব্দটি ব্যবহার করতেন। চিনের পক্ষে তার দর্শনের জাতীয় স্থানচ্যুতি তীব্রতা অনেক বেশি, কারণ সেই সময় ভারত একটি ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল না, বরং একাধিক রাজত্ব এই এলাকায় ক্রিয়াশীল ছিল। তবে, (চিন)কেন্দ্রিকতার সঙ্গে *চুংকুয়ো* শব্দটির সংযোগের কারণে এও বলা হয়ে থাকে যে, সুই-তাং রাজত্বকালে চিন জেনে গিয়েছিল যে সে "বিশ্বের কেন্দ্র নয়।" অমিতাভ

আচার্যর মতে, সাধারণ অব্দের প্রথমদিককার শতক থেকেই, তথাকথিত রেশম পথ (বা ইউরেশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা সুদীর্ঘ পরস্পর-সংযুক্ত বাণিজ্যপথ) এবং বৌদ্ধধর্ম "চিনকে বুঝতে সাহায্য করে যে, সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য কেন্দ্র ছড়িয়ে আছে" এবং এর ফলে, দুই হাজার বছর জুড়ে প্রচলিত চিনকেন্দ্রিক বিশ্ব-বিন্যাস সংক্রান্ত এই প্রভাবশালী চিরায়ত আখ্যানটি সম্পূর্ণ গুলিয়ে যায়।

সেই অনুসারে, এশিয়ার অতীত থেকে সত্যিই এমন একটি বিশ্ব-বিন্যাসের চিত্র উঠে আসে, যা বহু কেন্দ্রসহ একটি বিকেন্দ্রিত পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ করে। রাজনৈতিক, সামরিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মত অসংখ্য আন্তঃসংযোগ এই কেন্দ্রগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত রাখত এবং ভূ-রাজনৈতিক রূপরেখা ও অংশগ্রহণকারীদের পরিচয়ের উপর এই সংযোগগুলি গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এই আন্তঃসংযোগগুলিকে নির্মাণের ক্ষেত্রে এশিয়ার ক্ষুদ্রতর শক্তিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ভূমিকা লক্ষণীয়। চিন ও ভারতের মধ্যে সমুদ্রপথের পাশাপাশি, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় তৈরি জাহাজ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার জাহাজ চালানর প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই সংযোগগুলি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রগামী পোতনায়ক ও বণিকরা বহু শতাব্দী ধরে এশিয়াকে সংযুক্ত রেখেছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া কোনও চৈনিক বা ভারতীয় কেন্দ্রের সীমান্ত-অঞ্চল ছিল না বললেই হয় এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রতিপত্তি এশীয় বিশ্ব-বিন্যাসের ক্ষেত্রে গঠনমূলকই ছিল। অবশ্যই ক্ষমতার অসামঞ্জস্য অতীতের এশিয়াতেও ছিল, কিন্তু এশীয় বিশ্ব-বিন্যাস অসংখ্য অংশগ্রহণকারীর দ্বারা সম্মিলিতভাবে গঠিত ও পোষিত হয়েছিল।

বহুকেন্দ্রিক এশিয়ার এই আন্তঃসংযুক্ত অতীতে যে বিকেন্দ্রিত (অর্থাৎ কেন্দ্র-সীমান্ত নয়) ও দীর্ঘস্থায়ী বিশ্ব-বিন্যাসগুলি দেখা যেত, তাতে কোনও একক শক্তি *বিশ্বব্যাপী* (বা এশিয়াব্যাপী) পরম ক্ষমতাশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এই ব্যবস্থাটি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, তর্কযোগ্যভাবে, আরও আকর্ষণীয় একটি বিকল্পকে তুলে ধরে। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষমতা উভয়েই যৌথভাবে তাদের আন্তর্জাতিক বিন্যাসের নির্মাণ করে, এমন একটি পৃথিবীকে বাস্তবে পরিণত করার মূল সূত্রটি হল গভীর বহুত্ববাদকে সাগ্রহে গ্রহণ করা। এই বহুত্ববাদী ও "বিচিত্র" পৃথিবীতে বস্তুবাদী ক্ষমতার মধ্যে অসামঞ্জস্যের অস্তিত্ব হয়ত থাকবে, কিন্তু এই পৃথিবীগুলি এমন একটি বিন্যাসের প্রতি নির্দেশ করে যেখানে, কনফুসীয়, বৌদ্ধ, পার্সীয়-ইসলামিক বা অন্য যেকোনও ধর্মে বিশ্বাসী অংশগ্রহণকারীদের মতাদর্শে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক চলিষ্ণুতার মধ্যে সহাবস্থান ও স্থিতিশীলতা সম্ভব হবে।

মনজিত এস. পরদেশী (manjeet.pardesi@vuw.ac.nz) ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটনের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। *এই ভাষ্যটি লেখকের সাম্প্রতিকতম প্রবন্ধ; "ইন্টারকানেক্টেড এশিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড 'ওপেন' ওয়ার্ল্ড অর্ডারস"* অক্সফোর্ড রিসার্চ এনসাইক্লোপিডিয়া, *পলিটিক্স, ১৭ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে গৃহীত।*